★ ভারত সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষতার নমুনা ★

ব্যয় সঙ্কোচের নামে হাজারে হাজারে মধ্যবিত্ত কেরাণী ও শ্রমিক ছাঁটাই

★ রাষ্ট্রপতির মন্দির নির্মাণার্থে ২ লাখ টাকা খরচ ★

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | শনিবার, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫০, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

ভারতীয় গঠনতন্ত্রের ধারায় ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার কথা খুব ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ আদতে যে ও সব কথা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয় তা বহুবারই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে আর একবার হ'ল। আর তা হতেও বাধ্য, কারণ যে দল বর্ত্তমানে সরকার চালাচ্ছে সেই কংগ্রেস দল দেশীয় ধনিক শ্রেণীর শাসন ও শোষণ জনসাধারণের ওপর টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রচার করছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি, শ্রীযুত ট্যাণ্ডনতো এ বিষয়ে একজন পাণ্ডা। তাঁর রাষ্ট্রিয় সেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আঁতাত সর্বজন বিদিত ও অনেক দিন থেকে চলে আসছে। তারপর তাঁর প্রচারিত হিন্দী হিন্দু হিন্দুস্থান নীতির তো এখন একছত্র প্রতাপ ও প্রভাব কংগ্রেসী মহলে, স্বয়ং প্যাটেলজী ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তার সমর্থক ও প্রচারক। সুতরাং সেই কংগ্রেসী সরকারের নীতি যদি ধর্মান্ধতার খাদ বেয়ে চলে তা হলে অবাক হবার কিছু নেই।

প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সংঘবদ্ধ জনশক্তিকে সব চেয়ে ভয় করে বেশী, কারণ তারা জানে জনতা যদি সংঘবদ্ধ হয় তাহলে তারা অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। আর তা করলে শোষক দলের শাসন একদিনও টিকে থাকবে না। তাই শ্রমজীবি জনসাধারণ যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, যাতে তারা শোষণ বিরোধী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেই কারণে ধনিক শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রযন্ত্রটি সমস্ত রকম চেষ্টা করে জনতাকে বিচ্ছিন্ন করতে, তাদের মধ্যে বিভেদ জাগিয়ে তুলতে। এ কাজে সাম্প্রদায়িকতা আছে, প্রাদেশিকতা আছে আরও কত কি আছে। কংগ্রেস সভাপতি, শ্রীযুত ট্যাণ্ডনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও নীতি যেমন সকলের জানা, তেমনি ভারতীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রাদেশিকতাও কম জানা নয়। অথচ এঁরাই চালাচ্ছেন রাষ্ট্র।

কংগ্রেসী সরকারের রাষ্ট্রনীতির [illegible] তার। [illegible] নীতি [illegible] দুর্নীতি বলাই একমাত্র সঙ্গত। প্রতিটি বিষয়ে শুধু কেমন করে ব্যক্তিগত, উপদলীয় কিংবা আত্মীয় পরিজনদের লাভের মাত্রা বাড়ে তারই চেষ্টা চলেছে। জনতা খেতে পাচ্ছে না, পরতে পারছে না, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে—তার জন্যে সরকারের কণা মাত্র চিন্তা নেই; বরং সেই অবস্থা থেকে যাতে বেশী কিছু টাকা বা সুবিধা কামিয়ে নেওয়া যায় তার চেষ্টা চলেছে। খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানীর নাম করে অসম্ভব চড়া দাম দেওয়া হচ্ছে বন্ধুদের। অথচ দেশের মধ্যে চাষীদের কাছ হতে যখন ধান কেনা হচ্ছে তখন তার অর্দ্ধেক দামও দেওয়া হচ্ছে না। কলওয়ালারা চোখের ওপর কোটী কোটী টাকা মুনাফা লুঠে চলেছে কালবাজারে কাপড় বিক্রি করে; সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে চলেছে। হাজারে হাজারে শ্রমিক কর্মচারী সরকার নিজে ছাঁটাই করে চলেছে ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে অথচ বাজে ব্যয় বেড়েই চলেছে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্ত করার চেষ্টা কংগ্রেসী সরকার করছে—এই কথা সরকারী প্রচার বিভাগ থেকে বলা হয়ে থাকে। আর এই কথার দোহাই পেড়ে প্রত্যেকটা জনউন্নয়নকর পরিকল্পনা বাতিল করা হচ্ছে ও নির্বিচারে কম মাইনের শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে চলেছে। অথচ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের খেয়াল মেটাবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সীমানার মধ্যে ২ লাখ টাকা খরচ করে একটা মন্দির তৈরী হচ্ছে।

ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার সাধারণের সঙ্গে বাইরে গিয়ে পূজা দিতে পারেন না।

ভারতবর্ষে প্রয়োজনের মত খাদ্যশস্য তৈরী হয় তবুও দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব

সরকারী গুদাম—অপচয় ও চোরাকারবারের প্রধান কারণ

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে খাদ্য সমস্যা নিয়ে বিতর্ক হয়ে গেল। তাতে অনেক কথাই শোনা গেল, শুধু বোঝা গেল না ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব কেন আর দুর্ভিক্ষ প্রপড়িত অঞ্চলগুলিকে সাহায্য কতদূর করা হয়েছে। ভারতবর্ষের খাদ্যমন্ত্রী বলছেন, দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা নেই অথচ দুর্ভিক্ষ অঞ্চল দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। খাদ্যসংকট প্রথম দেখা দেয় মাদ্রাজে তার পর হল বিহারে, তার পর একে একে পশ্চিম বাংলা, রাজস্থান, বোম্বাই প্রদেশ সর্বত্রই ভীষণ খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। কর্ত্তব্য এড়াবার জন্যে সরকার এদের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল বলতে অস্বীকার করতে পারে কিন্তু বাস্তবে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

অথচ ভারতবর্ষে খাদ্যসংকট দেখা দেবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ভারতের এখনকার লোকসংখ্যা হল ৩২ কোটী, এদের মধ্যে শিশুরাও আছে। তারা বয়স্কদের সমান খায় না, তাই খাদ্যের হিসাব করার সময় জন সংখ্যাকে দশমিক আট দিয়ে গুণ করে প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিকভাবে সর্বত্রই ব্যবহার করা হয়। তাহলে ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে ২৫ কোটী প্রাপ্তবয়স্ক খাদ্য ব্যবহারের দিক থেকে। এখন গড়ে একজন ভারতবাসী দিনে আধসের খায় এই হিসাবে ভারতের খাদ্য দ্রব্যের মোট চাহিদা দাঁড়ায় ৪ কোটী ২৫ লাখ টন খাদ্য। এই পরিমান খাদ্যশস্য যদি ভারতবর্ষে উৎপাদিত হয়, তাহলে দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাব দেখা দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। দেখা যাক গত তিন বছরে ভারতবর্ষে কি পরিমান খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে উৎপাদিত খাদ্যের পরিমান হল:—

১৯৪৮ সালে	৪ কোটি	৪০ লাখ	৯৩ হাজার	টন
১৯৪৯ ,,	৪ ,,	৫২ ,,	৬০ ,,	,,
১৯৫০ ,,	৪	৫৮ ,,	৪১ ,,	,,

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সুতরাং ডাক পড়ল বিরাট ইঞ্জিনিয়ারদের। তাঁরা বহু ভেবে চিন্তে অনেকগুলি পরিকল্পনা তৈরী করলেন। তার মধ্যে তিনটি পরিকল্পনা মনোনীত হ'ল। তার প্রথমটিতে খরচ পড়বে ১লাখ, দ্বিতীয়টিতে ১লাখ ২৫ হাজার ও তৃতীয়টিতে ২ লাখ টাকা। অবশেষে শেষোক্তটিই পাকাপাকি মনোনীত করা হ'ল। রাষ্ট্রপতির এই খেয়াল মেটাবার জন্যে মন্ত্রীমণ্ডলী এগিয়ে এসেছে। সত্যিই, দেশের কর্ণধারের ইচ্ছা তো আর অপূরিত রাখা যায় না!

দেশবাসী না খেতে পেয়ে মরলে ক্ষতি কি? নেতাদের মান বাড়লে, হাত খরচ থাকলে, লাভ বাড়লেই দেশের উন্নতি হ'ল। এরই নাম গান্ধীয় অর্থনীতি।

ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের রূপ ও বৈশিষ্ট্য

দেশে দেশে আজ গণজাগরণের ঢেউ বইছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সামগ্রিক প্রচেষ্টাতে ও এই জনস্রোতের অগ্রগতিকে রোধা সম্ভব হচ্ছে না। সারা দুনিয়ার ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে জনগণ যেখানে সংঘবদ্ধ হতে পেরেছে, যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর একতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ধনতান্ত্রিক শোষণ টিকে থাকতে পারে না—এর ধ্বংস অনিবার্য্য। আমাদেরই প্রাতিবেশী চীন, যারা এতদিন আমাদের চেয়ে অনেক বেশী দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল, আজ তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা। জনতার মুক্তির দ্বার সেখানে দারিদ্র্যের কঠোর আক্রমনে রুদ্ধ নয়। নিজেদের খাওয়া পরার পূর্ণ ব্যবস্থা করেও প্রতিদিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব-এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ-ভিয়েৎনাম, মালয় এবং বিশেষ করে কোরিয়ার মত এতটুকু দেশের জনশক্তির কাছে সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত আমেরিকা তার আধুনিক সমর সম্ভার নিয়েও পিছু হটে আসতে বাধ্য হচ্ছে। জনতা যেখানে লৌহদৃঢ় একতা প্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে প্রতিক্রিয়ার প্রবেশ স্থান নেই—এসত্য আজ চেপে রাখা অসম্ভব।

ভারতবর্ষের অবস্থা আজ সম্পূর্ণ বিপরীত। দীর্ঘ ষাট বছরের এত আন্দোলন, এত আত্মত্যাগ—সব কিছুর ফল ভোগ করছে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণী। শুধুমাত্র ক্ষমতা লাভ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি শোষনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে তারা জনশক্তির ওপর প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে, জনতার মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করছে। জনতাকে আর বুঝিয়ে বলতে হয় না যে তথাকথিত স্বাধীনতা জনসাধারণের স্বাধীনতা নয় বরং মুষ্টিমেয় ধনিকের শোষণের অবাধ স্বাধীনতা। কংগ্রেসী সরকারের শোষণের দুর্দাম রথচক্র জনতার সম্মুখে নিত্যনূতন সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, অদৃষ্টবাদের পথ বেয়ে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসালে চলবে না—সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে আসতেই হবে। তার জন্য দায়িত্ব বোধ এবং প্রচেষ্টাই হল মেহনতী জনতার কর্ত্তব্য। নেতাদের গালভরা চটকদার বুলির ওপর নির্ভর না করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

মুক্তি পথের আলোচনার প্রারম্ভেই এসে পড়ে শ্রমিক শ্রেণীর একতা বা ট্রেড ইউনিয়ান ঐক্যের কথা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বর্ত্তমানের প্রতিক্রিয়াকে ভাঙ্গবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সাংগঠনিক গনশক্তি গড়ে তুলতে হবে কারণ তা না হলে প্রতিক্রিয়াকে রোধ করা যাবে না—এটা অত্যন্ত সহজ এবং বাস্তব সত্য। মনে রাখা দরকার যে জনতার সংঘবদ্ধতার অভাবের সুযোগ নিয়েই কংগ্রেসী সরকার জনতার ওপর নিরঙ্কুশ নির্যাতন চালাতে সক্ষম হচ্ছে। তাই শোষিত জনসাধারনের সচেতন লৌহদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলাই বর্ত্তমানের সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব।

অবশ্য শ্রমিক ঐক্যের প্রসঙ্গ আজ নূতন নয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ সমস্যা বহুদিন ধরেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সমস্যা যতটা প্রকট রূপ পরিগ্রহ করেছে পূর্ব্বে সেটা ছিল না। সুতরাং সমস্যাকে ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার যে শ্রমিক শ্রেণীর একতা চাইলেই সেটা আপনা থেকে আসে না—আন্দোলনের মারফৎ তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। শুধু তাই নয়—নূতন যাত্রা পথের প্রারম্ভে অতীতের ভুল ক্রটিও সাথে সাথে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমেই প্রশ্ন আসে—কেন এই অবস্থা? গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কেন আমাদের দেশে শক্তিশালী নয়? অতীতে ভারতে বামপন্থী নেতৃত্বে পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন কম হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে বিভিন্ন দাবীর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মঘট হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই শ্রমিকরা তাদের দাবীও মিটিয়ে নিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তখন ট্রেড-ইউনিয়ান আন্দোলনের জোয়ার থাকলেও একটা বিরাট ক্রটি নিয়ে সেই আন্দোলন এগিয়ে যাচ্ছিল। এই আন্দোলনকে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ফলে বিরাট শ্রমিকসাধারণ রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জ্জন করতে পারেনি। মুখে প্রায় প্রতিটি বামপন্থী দল সংস্কার বাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেও বাস্তবে তার জোয়ারেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। আর তাই ফল হিসেবে দেখতে পাই যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে শ্রমিকরা অতি সহজেই বিভ্রান্ত হয়েছে। একদিকে এই বিভ্রান্তি অন্যদিকে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্গতির সুযোগ নিয়ে ও প্রয়োজন মত শ্রমিকদের কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে জাতীয় সরকারের পক্ষপুটে গড়ে ওঠে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এই

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মধু ও হুল

বাংলা দেশের মাটি খুব সরস কিনা তাই সব কিছুই ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায়। সম্প্রতি ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে যে ব্যাঙের ছাতাটি জন্মেছে তিনি হলেন স্বনামধন্য পুরুষ, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি, শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষকে খাঁটি গান্ধীয় প্রথায় খিস্তি করতে গিয়ে তিনি বাংলা দেশের ওপর এক চোট ঝাল ঝেড়ে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য বাংলা দেশ জাতীয় আন্দোলনে কোন দিনই ভালভাবে সাড়া দেয়নি; এমন যে এমন '৪২ এর আন্দোলনে সেখানেও বাঙালা "জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র দেশ সাড়া দেয় নি, কলকাতায় দু একটি ট্রাম ও বাস ধ্বংস এবং শোভাযাত্রা বের করেই আগষ্ট বিপ্লবের অবসান ঘটে।" এদের কথা শুনলে বলতে ইচ্ছে করে, ভগবান, এদের ক্ষমা কর; এরাই কি বলছে তা এরাই জানে না। বাংলা দেশে মেদনীপুর বলে একটা জেলা আছে; সেখানে আগষ্ট আন্দোলনের সময় জাতীয় সরকার পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এ ধরণের কোন ধারণা কি ঘোষ মশাই এর আছে? ইতিহাস লেখা যে, বেনামীতে বালতির কারখানা আর পাকিস্থানে কয়েন রপ্তানীর ব্যবসা নয়, এ সত্যিটা এদের বোঝায় এত সময় ও ধৈর্য্য কার আছে? এঁদের ধারণা হয়েছে—যেহেতু এঁরা প্রত্যেকে এক একজন D. B. অর্থাৎ ডক্টর অফ ব্ল্যাক মার্কেটিং সেই হেতু সাহিত্য ইতিহাস দর্শন সব বিষয়েই এঁরা authority। এদের এ ধারণা এবং তজ্জনিত সর্ব বিষয়ে না জেনে ও কুওরন প্রবৃত্তি জনতার হাতের উপযুক্ত দাওয়াই না পেলে সারবে না।

★

Honesty is the best policy—এই রকম একটা নীতি কথার বড় প্রচলন; এইটের দোহাই দিয়ে নানা জনে নানা কথা বলে—চুরি জোচ্চুরি সবই খারাপ পলিসির মধ্যে পড়ে যায় একথাটা মানলে। তাই এর উপযুক্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেশকাল পাত্রভেদে সব জিনিষের পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং তাদের সংজ্ঞাও বদলায়। এতদিন দেশে বিদেশী শাসন ছিল এখন খাঁটী রামরাজত্ব। অতএব আগেকার সততার সংজ্ঞা এখন অচল। এখন Honesty বলতে ব্যবসার বাজারে কালোবাজারী, চাকুরীর ক্ষেত্রে ঘুষ, পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছেলের নম্বর বাড়ান, মন্ত্রীত্বের বেলায় বাড়ী গাড়ী হাতান। কথাটা যদি বিশ্বাস না হয় চেয়ে দেখুন, যারা কালোবাজার আলো করে বসে আছেন তাঁদের মধ্যে আটজন হলেন সরকারের শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ব্যাপারটা সকলেরই জানা, মন্ত্রীদের কেউ কেউ যে ইতিমধ্যে ৬৫ হাজার টাকায় বন্ধক থাকা বাড়ী মুক্ত করে নিয়েছেন। আর কেউ যে ক্যামাক ষ্ট্রীটের দিকে বাড়ী তুলেছেন এ রকম কথা বাতাসে ভাসছে। বাকি রইল চাকুরীর উদাহরণ। কলকাতার জাহাজী অফিসের সিপিং মাষ্টারের বিরুদ্ধে দু হাতে পয়সা লোঠার অভিযোগ উঠলে এবং তদন্তের পর ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাঁকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে তাঁর পূর্ব্বপদ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে পাঠাবার ও দুটি ইনক্রিমেণ্ট বন্ধের সুপারিশ করার পরও তাঁকে প্রমোশন দিয়ে বাংলা সেক্রেটারিয়েটে আনার চেষ্টা চলছে। এর পর কোন সন্দেহ থাকে Honestyএর সংজ্ঞা বদলেছে কিনা?

★

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছা তদন্তের রিপোর্ট সিণ্ডিকেটে পেশ করা হবে এ খবরটা শুনে পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের এত যক্ষ্মা হচ্ছে কেন তা তদন্ত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে উপস্থিত হন। এ বিষয় নিয়ে তাঁর আলোচনা চলে কয়েকজন বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে। যক্ষ্মা বড় মারাত্মক রোগ; জীবাণুকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় পুড়িয়ে মারা। সুতরাং এর পর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবপত্রে আগুন ধরে যায় তাহলে ভালই বলতে হবে। রোগ বাড়বে না। আশা করা অন্যায় হবে ডাঃ রায়ের মত বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসক এই রকম উপদেশ দিয়েছেন।

★ কোরিয়ায় মুক্তিফৌজের জয় অবশ্যম্ভাবী ★

জেনারেল ম্যাক আর্থার সাহেব এই কদিন আগে দম্ভ করে বলেছিলেন—কোরিয়ার লড়াই খতম হল বলে ; মার্কিণ সৈন্যরা বড়দিনের আমোদ আহ্লাদ নিজের দেশে বসেই করবে। বড়ই দুঃখের কথা জেনারেল সাহেবের সে ভবিষ্যত বাণী সফল হল না, তাঁর সে আশায় ছাই পড়ল—আজ ইঙ্গ মার্কিন ও তাদের পোঁধরা ফ্যাসিষ্ট দস্যুর দলকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হচ্ছে কোরিয়া থেকে। একটা স্বাধীনতাকামী দেশের জনসাধারণকে নিশ্চিহ্ন করার আনন্দ বড়দিনের সময় দেশে বসে করা গেল না—এত বড় দুঃখ রাখার ঠাঁই কোথায়। নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে, গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিয়ে, সহর ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, হাজারে হাজারে লোককে জীবন্ত কবর দিয়ে, দেশের নরনারীকে উলঙ্গ করে চাবুক লাগিয়ে, মেয়েদের পৈশাচিকভাবে বলাৎকার করেও ম্যাক আর্থার ও তাঁর পোষা ভাড়াটে সৈন্যের দল স্বাধীনতাকামী কোরিয়াবাসীর মনোবল ভাঙতে পারেনি এতটুকুও। তাই এবার চলেছে এটম বোমার হুমকি, সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করার তোড়জোড়। সারা বিশ্বের প্রগতিবাদী জনতার প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে যদি আমেরিকার ওয়াল ষ্ট্রীটের কর্তারা আনবিক বোমা কোরিয়ার বুকে ফেলে তাহলে তার উপযুক্ত জবাবই দেবে বিশ্ববাসী, বিশেষ করে এশিয়ার নবজাগ্রত জনশক্তি। সে অত্যাচারে ও ধ্বংসেও যে অমর কোরিয়াকে ঘায়েল করা যাবে না, এ কথা ধ্রুব সত্য। কারণ স্বদেশপ্রেম ও সজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠাকে বোমা পিস্তল দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জ্জরিত করে দৈহিক অবলুপ্তি ঘটাতে পারলেও ইস্পাত-কঠোর মনের নিষ্ঠাকে নষ্ট করা অসম্ভব—মরণের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও দেশের স্বাধীনতার জন্য সে লড়ে যাবে। এইখানেই হল তার শক্তির উৎস।

এ শক্তির পরিচয় কোরিয়াবাসী দিয়েছে। ৩০০ যুদ্ধ জাহাজ ও ৫০০ বিমান নিয়ে দিনের পর দিন বর্ব্বর ধ্বংস করেও কোরিয়াবাসীদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদীর দল গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণকারীরা দখল করেছে কিন্তু স্বাধীনতাকামী কোরিয়াবাসীর গেরিলা যুদ্ধে তাদের নিশ্চিন্ত আরাম ঘুচে গেছে, মুক্তি ফৌজের এই সব গেরিলা ইউনিটের হাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ লড়াই তো সাম্রাজ্যবাদী ভাড়াটে সৈন্যদের অর্থের বিনিময়ে লড়াই নয় যে সৈন্যদলের জয় পরাজয়ই দেশের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে দেবে, এ হল জনযুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ফ্যাসিষ্ট শক্তির কাছে মুক্তি ফৌজের সাময়িক সাময়িক পরাজয় শেষ কথা নয়, জনশক্তি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলে আক্রমণকারীকে হটিয়ে দিতে, অস্থির করে তুলতে, নিশ্চিহ্ন করতে। বছরের পর বছর ধরে তা চলে, দিনরাত বিরাম নেই। ভাড়াটে সৈন্যের দল অতিষ্ঠ হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর মুক্তি ফৌজের উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়েই চলে। মুক্তি ফৌজ কোন দিনই তাই চূড়ান্তভাবে পরাজিত হতে পারে না। লাল চীনের বিরুদ্ধে জাপানের আক্রমণ, ইউরোপের দেশগুলিতে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ—প্রতিটি ক্ষেত্রে এ কথার সত্যতা প্রমানিত হয়েছে।

একদিকে এক মুঠা ভাতের জন্য লড়াই, অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই, একদিকে কয়েকজন কোটী-পতিদের মুনাফা বাড়াবার উদ্দেশ্যে লড়াই অন্যদিকে নিজেকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম, একদিকে অন্যায়ের পক্ষে, স্বাধীনতাকামী জনতার স্বাধীনতা হরণের জন্য লড়াই অন্যদিকে ন্যায়ের জন্য মুক্তির জন্য সর্ব্বাত্মক অভিযান। এতে জয় শেষোক্ত দলের না হয়ে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ভাড়াটে সৈন্যরা কেন কোরিয়ার বুকে লড়ছে তা তারা বুঝতে পারে না—তারা শুধু জানে, না লড়লে উপোস করে মরতে হবে। সুতরাং না লড়ে উপায় নেই। আর কোরিয়ার মুক্তি ফৌজ জানে, কি আদর্শের প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য। সে বোঝে লড়াইয়ে পরাজয়ের অর্থ দাসে পরিণত হওয়া আর জয়ের অর্থ সুখী শান্তিপূর্ণ শোষণহীন জীবনের দ্বার মুক্ত হওয়া। সুতরাং মুক্তি ফৌজের চূড়ান্ত জয় না হয়ে পারে না। আমেরিকার জনসাধারণ যে যুদ্ধ চায় না এ কথার প্রমাণ হল—Cleveland News এর মত কাগজে Prestonএর এই লেখা—"This is Harry Truman's War and General Mac. Arthur's war and Louis Johnson's war. This isn't the people's war. The trend is one of bitterness. Why are we in this mess ?"—এ হল ট্রুম্যান, ম্যাক আর্থার কিংবা জনগণের যুদ্ধ ; জনসাধারণের যুদ্ধ নয়। জনতা কেন এরজন্য ভুগবে ? আর কোরিয়ায়—"Koreans armed to a man go to the battle-fields to fight the American bandits"। এ অবস্থা না হয়ে পারে না ; দক্ষিণ কোরিয়ার ভূতপূর্ব্ব সামরিক উপদেষ্টা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রবার্ট সৈন্যসংগ্রহ সম্বন্ধে বলেছেন—"We could pay them little—five dollar per month and a bowl of rice per day if they do not fight, they won't eat"—মাসে পাঁচ ডলার করে মাইনে আর দিনে এক বাটি করে ভাত দিলেই হল, কারণ লড়াই না করলে তাদের উপোস করতে হবে। এর পর মার্কিন রাষ্ট্রের মহান গণতন্ত্র ও সাম্যের পরিচয় পেতে আদৌ দেরী হয় না।

যেখানে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য সংগ্রহ জোর করে করতে হয় সেখানে মুক্তি ফৌজে দলে দলে লোক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেয়, কারণ মুক্তি ফৌজের জয়ের অর্থ জনতার মুক্তি। কোরিয়ার জনসাধারণ দীর্ঘ দিন জাপানী শাসনে থাকার সময় অত্যাচার ও শোষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জনরাষ্ট্র তাদের সে অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সুতরাং সেই জনরাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করার সমস্ত ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকে জনসাধারণ ব্যর্থ করে দেবার জন্য দাঁড়াবে এইটাই হল স্বাভাবিক। যে অল্প সময়ের জন্য কোরিয়ার গণমুক্তি ফৌজ দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল সেই সময়ের মধ্যেই তারা ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করে কৃষক সমাজকে সামন্ততন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্ত করেছে। এইটাই হল মুক্তি ফৌজের রণনীতি ও কৌশল। শোষিত জনতার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ধারাল হাতিয়ার মার্কসবাদ লেনিনবাদ অনুসারে মুক্তি ফৌজের রণনীতি নিরূপিত ও চালিত। "Marxism Leninism constitute the guiding policies of revolutionary War"। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিপ্লবের সঠিক রণনীতি ও কৌশলকে কেন্দ্র করেই মুক্তি ফৌজ তার অভিযান চালায়। ফলে সামগ্রিকভাবে বিরাট জনশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ও সমর্থন তার পেছনে চলে আসে। এই জনশক্তির সমর্থন ও সাহায্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীর দল পেতে পারে না। তাই মুক্তি ফৌজের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সর্ব্বশেষে কোরিয়ার বীর সন্তানদের পেছনে বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রগতিবাদী লোকের সমর্থন আছে। এশিয়ার মুক্তি দূত, নবজাগ্রত মহাচীনের জনসাধারণ কোরিয়ার যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দিয়েছে। তারা বুঝেছে মহাচীনের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্গে কোরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করতে যদি সক্ষম হয় ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর দল তাহলে মহাচীনের সমূহ বিপদ, তার স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে। তাই চৈনিক জনসাধারণের বাণী হল, যে দেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করে না সে নিজের দেশের স্বাধীনতাও রক্ষা করতে পারে না। আর বিশেষ করে সিউলে যে গোপন দলিল পাওয়া গিয়েছে তাতে পরিষ্কারভাবে আমেরিকার উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গিয়েছে—মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ মার্কিনের পরিকল্পনার অন্তর্গত। জেনারেল ম্যাক আর্থারও মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করার কথা বহু বার বলেছেন, বাস্তবে ১৫ বার বোমাবর্ষণও করেছেন।

কোরিয়ার মুক্তি ফৌজ স্বাধীনতা, মুক্তি, সমাজতন্ত্র ও স্থায়ী শান্তির জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তাতে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের এতে দুঃখ হতে পারে কিন্তু সারা পৃথিবীর শান্তিকামী প্রগতিশীল মানুষ চায়—কোরিয়াবাসীরা ইঙ্গমার্কিন চক্রান্ত ও আক্রমণকে নিশ্চিহ্ন করে সুখী ও মুক্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যাক, পৃথিবীর বুকে আর একটি দেশে অসত্য, অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের প্রাচীর ভেঙে পড়ুক। ভারতবাসীরাও চায়—সাম্রাজ্যবাদী বেড়াজাল এশিয়ার বুক থেকে উৎখাত হক, এই মহান মহাদেশে আর একটি দেশে জনরাষ্ট্র কায়েম হক, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী জঙ্গী ভারতীয় মানুষের বন্ধুর দল তাদের লক্ষ্যে পৌঁছুক, অমর কোরিয়ার জয় হক।

আসামে ঘেটো ব্যবস্থা চালু

দক্ষিণ আফ্রিকার মালান সরকার ও আসামের কংগ্রেসী সরকারের নীতি এক

● ৭০ বছর আসামে বাস করেও বিদেশী ●

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রত্যেক সত্য ও গণতন্ত্রী ব্যক্তি মাত্রেই করবে। মানুষের মূল অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোন রাষ্ট্রেরই নেই। বর্ণ বৈষম্য ও জাতি বিদ্বেষ ফ্যাসিস্তদের মূলধন, প্রকৃত গণতন্ত্রের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না। কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা এ সব কথা প্রায়ই খুব তারস্বরে ঘোষণা করে থাকেন। এই সেদিনও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত জাতি সংঘ পরিষদে বলেছেন—"এই বৈষম্য মূলক আচরণ মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের চার্টার ও ঘোষণার বিরোধী কিনা তা পরিষ্কার করে বলার দিন এসেছে।" অথচ যে অভিযোগ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছেন কংগ্রেসী সরকারের প্রতিনিধি সেই দোষেই দোষী কংগ্রেসী সরকার। আসামে দক্ষিণ আফ্রিকার মত বর্ণবৈষম্য চূড়ান্তভাবে চলছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পূর্ব্বতন আসামের যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেখান থেকে উদ্বাস্তু পরিবার আসামে গেলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করা হয় যে, "পাকিস্থান হতে উদ্বাস্তুদের আগমনে সংকট সৃষ্টি হওয়ায় এবং সহরে ও গ্রামে জাতীয় সাম্য (racial equilibrium) বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার আবার তার নীতি ঘোষণা করছে যে, প্রদেশের প্রকৃত অধিবাসী ছাড়া অন্য কাউকে কোন কারণেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। অসমীয়া ব্যতীত আসমে আর যাদের বাড়ী বা জমি আছে এবং যারা আসামকে বাসভূমি বলে গ্রহণ করেছে তাদেরও প্রকৃত অধিবাসী নয় বলে ধরতে হবে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে, প্রদেশের জাতীয় সাম্যের বর্ত্তমান অনুপাত ওলট-পালট হতে পারে এমন উদ্বাস্তু আগমন সরকার বরদাস্ত করবে না।" এই আদেশ জারীর ফলে যে সমস্ত লোক অসমীয়া নয় কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আসামে বসবাস করছে এবং ঐ প্রদেশকে যারা পিতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছে তারাও আসামের বাসিন্দা বলে স্বীকৃত হচ্ছে না। ৭০ বছর বাস করেও অধিবাসী হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি এক ভদ্রলোকের। আসামের চা বাগানে হাজার হাজার চা শ্রমিক এই আইনের জোরে অধিকার চ্যুত। ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে ভারতীয় গঠনতন্ত্র গৃহিত হয়েছে তাতেও ডোমিসাইল সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তা মানতে আসাম সরকার প্রস্তুত নয়।

এই ধরণের অধিকার হরণের সাথে সাথে জুলুম বাজীর মাত্রাও বেড়ে চলেছে। জমি জায়গা কেনা এমন কি নামখারিজ করা এবং চাকুরী প্রভৃতি যে সমস্ত সুবিধা অধিবাসীরা ভোগ করে সে সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জেনেও চুপ করে আছে। কারণ কংগ্রেস চায় প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াতে পারলে জনতার একতায় ফাটল ধরিয়ে শোষণ করা যাবে বেশী দিন।

পুঁজিপতিদের কোন লাভই হচ্ছে না চাষী-শ্রমিকদের অবস্থাই এখন লাভের

সর্দারজীর ভাষ্যের প্রমাণ

● বোম্বাইএর দুটি কাপড়ের কলের কর্তাদের মধ্যে ১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা বোনাস হিসাবে ভাগবাঁটোয়ারা ●

ভারতের উপপ্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত প্যাটেল আমেদাবাদের শ্রমিকদের এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন, "ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা আমার চেয়ে কে বেশী জানে? আমি নিজেই একজন শ্রমিক। এ কথা শুনে আমেদাবাদের সূতাকল শ্রমিকরা হয়ত অবাক হয়ে ভেবেছিল—এ কেমন হল? সর্দ্দারজী শ্রমিক? এ প্রশ্নের জবাব পেতে শ্রমিকদের বেশী দিন দেরী করতে হয় নি। সেই সর্দ্দারজী দু'একদিন বাদেই ফতোয়া দিলেন—শ্রমিকরা যা পাচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ বর্ত্তমান সময়ে পুঁজিপতিদের কোন লাভই হচ্ছে না। শ্রমিক ও চাষীদের অবস্থাই এখন লাভের। সর্দ্দারজী যে কোন জাতের শ্রমিক তা তাঁর এই কথা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল মজুরদের কাছে। খদ্দর পরা শ্রমিক দরদী তিনি শ্রমিকদের সভায়; আসলে তিনি হলেন কোটীপতি মিলমালিকদের একান্ত আপনার লোক। তাই তাঁর জন্মদিনে লাখ লাখ টাকা উপঢৌকন দেয় বোম্বাই এর কলওয়ালাদের দল। এই বারই তো ১৬ লাখ টাকার মত পেয়েছেন সর্দ্দারজী তাঁর জন্মবার্ষিকীতে। যে সমস্ত কোটীপতির দল বৃদ্ধবয়সে তাঁর সংস্থানে উপরিপাওনার এরকম ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তাদের হয়ে যদি প্রচারে না নামা হয়, তাহলে নিমক হারামী হয় যে, আর তাদের মুনাফাকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে জন্মবার্ষিকীর উপহারই বা আসে কোথা হতে? বরং মুনাফা যদি বাড়ে টাকার মাপে শ্রদ্ধার বহর বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করে বললে দোষ কি? গান্ধীয় নিষ্ঠা ও নীতি বোধের তা বিরুদ্ধাচরণ করে না।

প্যাটেল সাহেবের নিজের প্রদেশ হল বোম্বাই। সেখানকার কলওয়ালাদের কি রকম দুঃসময় চলেছে তার খবর হল এই যে, সেখানে দুটি সূতাকলের কর্ত্তা ব্যক্তিরা বোনাস শেয়ার হিসেবে ১কোটী ২৬ লাখ টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। বোম্বাইয়ে সাম্প্রতিক যে সূতাকল ধর্ম্মঘট হয়ে গেল তাতে ২ লাখ ৪০ হাজার শ্রমিক তিন মাসের বোনাস হিসেবে যে টাকা চেয়েছিল তার শতকরা ৬৬ ভাগ এক কলমের খোঁচায় কর্ত্তাদের পকেটজাত হল। অথচ শ্রমিকরা যখন বোনাস চেয়েছিল তখন তাদের বলা হয়েছিল কাপড়ের কলগুলিতে লাভ হচ্ছে না; সুতরাং বোনাস দেওয়া হবে না। শ্রমিক প্রতিনিধিরা বলে, রিজার্ভ ফাণ্ড হিসেবে যে বিরাট টাকা রয়েছে তা দিয়ে মিলের কাজ কোন দিনই হয় না বরং ঐ টাকা পুঁজিপতিরা নানা অজুহাতে আত্মসাৎ করে; ঐ রিজার্ভ ফাণ্ড হতে বোনাস দেওয়া হ'ক। এ কথা মিল মালিকরা শোনেনি এবং সরকার পক্ষ মিল মালিকদের সমর্থনে গুলি গ্যাস নিয়ে এগিয়ে আসে; ধর্ম্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি, গ্যাস, লাঠি বর্ষণ করে। অথচ বোম্বে ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ডিরেক্টাররা এক সভা করে সিদ্ধান্ত করে ১কোটী ২৬ লাখ টাকার অংশীদারদের বোনাস শেয়ার দেওয়া হবে এবং এই টাকা রিজার্ভ ফাণ্ড হতে খরচ হবে। এইভাবেই লাভের মোটা অংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে সরিয়ে রেখে লাভ হয় নি বলে বোঝান হয় তারপর সেই সরিয়ে রাখা টাকা ভাগ করে নেওয়া হয়।

বোম্বে ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ইতিহাসে এই ধরণের কাজ নতুন নয়। ১৯২৮ সালে কোম্পানীর মূলধন ছিল ৩১ লাখ টাকা; ১৯৫০ সালে তা হয়েছে ২৫২ লাখ টাকা। এই মূলধন

আদালত কর্তৃক প্রেস ইমার্জেন্সি

কমরেড চন্দের

কংগ্রেসী বড়কর্ত্তাদের গঠনতন্ত্র

ভারতীয় গণপরিষদে যে গঠনতন্ত্রটি জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্রের কথা দল ও প্রগতিবাদী লোক স্বীকার করেছেন এবং এর পর যাতে ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী শাসনই পার্লামেণ্টে নিরাপত্তা আইনটি পাস করিয়ে তাতেও রক্ষে হল না; কংগ্রেসী সরকারের সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের জন্য কারারুদ্ধ করতে থাকায় কংগ্রেস সরকার এখন গঠন এইভাবে গণতন্ত্র বিরোধী গঠনতন্ত্রকে আরও গ

সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ, ডি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিহার প্রাদেশিক সংগঠক কমরেড প্রীতিশ চন্দ এবং সিন্ধ্রি ফারটিলাইজার প্রোজেক্টের কর্ম্মচারী শ্রী শিশির ঘোষকে বিহার পুলিশ প্রেস ইমার্জেন্সি অ্যাক্ট অনুসারে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার কর্তৃক প্রকাশিত—"সাচ্চি আজাদী শান্তি আউর সমাজবাদ কায়েম করণে কে লিয়ে"—বইটি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে ধনবাদের শ্রী এল, কে,

|দ্ধির জন্য অংশীদারদের একটি পয়সাও দিতে হয়নি। প্রথমে যার একখানা শয়ার ছিল ১৯৪৭ সালে তার হল চার |ানা এবং ১৯৫০ সালে আটখানা। এই- |াবে বিনা পয়সায় আটগুণ লাভ অংশীদার পল বোনাস শেয়ার হিসেবে লভ্যাংশ |াড়াও।

এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়ে থাকে য, অংশীদারদের অধিকাংশই হ'ল গরীব ধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সুতরাং তাদের স্বার্থের |কে লক্ষ্য রেখেই এই ব্যবস্থা করা য়েছে। এ কথাটাও পুঁজিপতিদের ন্যান্য কথার মত নির্জ্জলা মিথ্যা। |াম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারই মিলের ্যানেজিং এজেন্টস্ নওরসজী ওয়াদিয়া ও সঙ্গের কুক্ষীগত। এসব তো গেল |ইন সঙ্গত ফাঁকি। এছাড়া ম্যানেজিং |জেণ্টদের চুরিচামারি হাজার রকমে |ছে। তুলা কেনার জন্যে বেনামে এক তিষ্ঠান খাড়া ও বাজারদরের চেয়ে |র কাছ থেকে বেশী দামে তুলা কিনে |টা টাকা পকেটজাত করা হয়ে থাকে। গী কাপড় বলে নেহাৎ নামমাত্র দামে জার গাঁট ভাল কাপড় নিজেদের |াককে বিক্রী করে দিয়ে সেগুলিকে |লোবাজারী করা হামেসাই চলেছে। |ল তুলা-ক্রয়-এজেন্সি খুলে তাকে লাখ

টাকা দাম হিসেবে অগ্রিম দেওয়ার পর রাতারাতি সে কোম্পানীকে লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এসব কথা সরকার জানে। অথচ সে সব বেআইনী নয়। এত করেও নাকি মিলমালিকদের মোটেই লাভ হয় হয় না। আর যে শ্রমজীবি শ্রমিক কেরাণীর দল মুখে রক্ত তুলেও স্ত্রীপুত্র পরিবারের মুখে দুবেলা দু-মুঠো ভাত দিতে পারে না, একখানা কাপড় দিয়ে লজ্জা নিবারণ করার ব্যবস্থা করতে পারে না তারাই স্বর্গসুখে আছে। এই হল কংগ্রেসী ভাষ্য। যতদিন কংগ্রেসী দুঃশাসন চলবে ততদিন এ ভাষ্য চলবে, তার সঙ্গে জনতার রক্ত শোষণ করে বড়লোকের দল পেট মোটা করবে। ভালভাবে মানুষের মত বাঁচতে হলে প্রথম কাজ হল কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের সংঘবদ্ধ করা, নিজেদের জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলা। তার চেষ্টাই করতে হবে।

| অ্যাক্ট বেআইনী ঘোষিত

মুক্তিলাভ

পরিবর্ত্তনের তোড়জোড়

গৃহিত হয়েছে তার গণতন্ত্রবিরোধী |ত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ও সেই মর্ম্মে মত ও প্রকাশ করেছেন। |ক নিরঙ্কুশে চালান যায় সেই উদ্দেশ্যে নিয়ে গণতন্ত্রের সমাধি দেওয়া হল। | আদালতও বিনা বিচারে আটক, |রা প্রভৃতিকে বেআইনী বলে ঘোষণা |তন্ত্র পালটাতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে। |তন্ত্র বিরোধী করার চেষ্টা চলেছে।

|রেনের ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বিচার |ল। গত ৩০ শে নভেম্বর রায়দান প্রসঙ্গে |জিষ্ট্রেট প্রেস ইমার্জ্জেন্সি অ্যাক্টের চার |রায় ১ডি উপধারাকে গণতন্ত্রের ১৯ |রার প্রতিকূল বলে মত প্রকাশ করে আইনী বলে ঘোষণা করেন। তিনি |রও বলেন যে কোন লোক বা দলের |কারকে সমালোচনা ও জন স্বার্থের |তিরজন্য সরকার পরিবর্ত্তনকরার মৌলিক |কার আছে। কমরেড চন্দ ও শিশির ঘোষ |ক্ত লাভ করেছেন। অভিযুক্ত চন্দ ও |ের পক্ষ সমর্থন করেন ধানবাদ কোর্টের |শিষ্ট আইনজীবি শ্রীযুত কানাই পাল।

★ উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার নামে ৪০ লাখ টাকা গাপ ★

● আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে টাকা ও জমিবিলি

●● রাজস্থান ও কেন্দ্রায় সরকারের কাজ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি ও তাদের প্রচার দপ্তর হতে প্রায়ই ঘোষণা করা হয়ে থাকে যে, উদ্বাস্তুদের যে ভাবে সাহায্য করা হচ্ছে তাতে তাদের সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত। পশ্চিম বাংলার জন-সাধারণ শেয়ালদহ ষ্টেশনে আর সরকারী সাহায্য শিবিরের নামে যে অযন্ত পশুরও বাসের অনুপযুক্ত জায়গাগুলি আছে সেখানে উদ্বাস্তুদের সাহায্যের নমুনা ভাল ভাবে দেখেছে। দলে দলে লোক বিনা চিকিৎসায় মারা পড়ছে, খাবারের ব্যবস্থা নেই, মাথা গোঁজার এতটুকু স্থানও নেই। তবুও নাকি কোটী কোটী টাকা খরচ হয়ে গেল।

খরচ যে হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে সে খরচ উদ্বাস্তুদের জন্যে নয়, তা হচ্ছে মন্ত্রীদের বন্ধু বান্ধব আর আপনার লোকদের পকেট ভর্ত্তির কাজে। দেশে যখন মড়ক লাগে, শকুনি গৃধিনীর আনন্দ তখন বাড়ে। সেই রকমে জনজীবনে সমস্যা যত দেখা দেয় নেতাদের মৌকাও তত বাড়ে, লুঠে পুটে খাবার সুবিধা হয় তত বেশী।

বাস্তুহারাদের ছদ্মবেশে একদল বাস্তু ঘুঘু আছে। এরা হ'ল সরকারের দুর্নীতির ধারক, সরকারী উপরীওয়ালাদের পেটোয়া। এদেরই নামে মোটা মোটা টাকা মঞ্জুর হচ্ছে, আর সেই টাকা ভাগাভাগি হচ্ছে এই সব বাস্তু ঘুঘু ও সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে। এদের কেউ হল মন্ত্রীদের বন্ধুবান্ধব, কেউ বা আত্মীয়, কেউবা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদের একান্ত পরিচিত, কেউ বা কর্ম্মচারি। এরা কেউই প্রকৃত বাস্তুহারা নয়। দীর্ঘ দিন থেকে এরা পাকিস্থানস্থ বাসস্থান ত্যাগী। আজ এরাই হয়ে উঠেছে আসল উদ্বাস্তু আর যে সমস্ত লোক রাস্তায় ও সরকারি শিবিরে ইট কাঠ পাথরের মত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গড়িয়ে চলেছে তারা কেউ নয়। ভারত সরকারকে বিপন্ন করা ও বিনা পরিশ্রমে জীবন ধারণের মতলবে নাকি তারা চলে এসেছে এই হল কংগ্রেসী নেতাদের ধারণা। সরকারি দুর্নীতিকে চালু রাখার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হচ্ছে এই সব বাস্তুঘুঘুর দলকে। এদেরই মাধ্যমে চলেছে লাখ লাখ টাকার খেল।

গত বছর ঠিক হয়, পশ্চিম পাকিস্থান হতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু চলে এসেছে তাদের রাজস্থানের ভরতপুর, আলওয়ার এবং মৎস্যপ্রদেশে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হবে। এই পুনর্বসতির অঙ্গ হিসাবে প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য ১০ হতে ১৫ একর জমি এবং ঋন হিসেবে ১০০০৲ টাকা করে দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু দেখা গেল এত খাঁটি গরীব বাস্তুহারা পরিবার থাকতে ৪হাজার এমন সব বাস্তুঘুঘু পরিবারকে ১০০০, টাকা করে ঋণ দেওয়া হয়েছে যাদের কেউই কৃষিজীবি নয় এবং যাদের এখন আর কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। জমি বিলির ব্যাপারেও তাই

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহারাষ্ট্রে চিনিকল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট

মালিক কর্ত্তৃক শালিসীর রায় অগ্রাহ্য, সরকার নির্ব্বিকার

● শ্রমিক সাহায্যার্থে চাষীদের উদ্যম ●

গত আড়াইমাস ধরে তিলকনগরের মহারাষ্ট্র চিনি কলের এক হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে রয়েছে। ইনডাসট্রিয়াল কোর্ট ১৯৪৭-৪৮ সালের বোনাস হিসাবে সাড়ে চার মাসের মাহিনা দেবার হুকুম দেয়। মিল কর্ত্তৃপক্ষ এ আদেশ অগ্রাহ্য করে এবং ৫৮০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে নতুন লোক নিযুক্ত করে। কিন্তু নতুন শ্রমিকরাও ধর্ম্মঘটে যোগদান করায় ব্যাপারটা হাইকোর্টে গড়ায়। হাইকোর্ট শ্রমিকদের দাবীকে আইনসঙ্গত বলে রায় দেয়। কিন্তু তবুও মালিকপক্ষ নানা অজুহাত দেখিয়ে বোনাস দেওয়া বন্ধ রাখে এবং বলে যেহেতু বহু মজুর চুক্তিবদ্ধ সেইহেতু তারা বোনাস পাবে না। এই প্রকারে নানা ভাবে মালিক পক্ষ জবরদস্তিমূলক ব্যবহার করে। সর্ব্বশেষে তারা যে ৫৮০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে তাদের পুনর্নিয়োগ করতে [illegible] সঙ্গত দাবীর সমর্থনে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মঘট চালিয়ে চলেছে। আশপাশের সমস্ত চাষীরা শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। প্রতিদিন তারা ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে ১৫০০ করে রুটী বিনা-মূল্যে বিলি করছে।

মোরারজী সরকার মালিক পক্ষ এই রকম বেআইনী কাজ করে চললেও নির্বিকার চিত্ত। ইনডাষ্ট্রিয়াল কোর্টের রায় অবমাননা করলে কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে এই বিধান আইনে আছে। অথচ মালিকপক্ষ সেই কোর্ট এমন কি হাইকোর্টের রায়কে অস্বীকার করছে তবুও তাদের কোন শাস্তি হয়নি। এ ব্যাপার কংগ্রেসী আমলে নিত্য নৈমিত্তিক; ধনিক মালিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই কংগ্রেসী সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। সে জন্য সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ও নানা বিধিনিষেধের অস্ত্র নিয়ে তারা মালিকের হয়ে এগিয়ে আসে [illegible] প্রতিটি প্রদেশেই এই ব্যবস্থা চলছে। এরই নাম কংগ্রেসী শ্রমনীতি।

★ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাসিজমের গোড়াপত্তন ★

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ফ্যাসিজমের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে প্রগতিশীল মানব সমাজ উদ্বেগ বোধ করছেন। এই ফ্যাসিষ্ট প্রবণতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাই উৎকণ্ঠা অহেতুক নয়।

প্রখ্যাত প্রগতিশীল মার্কিন লেখক আলবার্ট কাহ্ন বলেছেন, মার্কিন জনগণ আজ এমন দুটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন যার কাছে আর সব কথা চাপা পড়ে যায়। সে দুটি প্রশ্ন হচ্ছে: আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ হবে, না ফ্যাসিজমের দেশ? বিশ্বশান্তি, না মহাযুদ্ধ?

একচেটে পুঁজিতন্ত্রের উদগ্র সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সন্ত্রাসবাদী একছত্র শাসনেরই নাম ফ্যাসিজম। মূলধনতন্ত্রের দ্রুত ঘনায়মান সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় বৃহৎ মূলধনের একচেটে মালিকচক্র ফ্যাসিজমের আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পূর্ব্বেকার মর্য্যাদা বজায় রাখতে পেরেছে। আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে বরং আরো শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের পরে আমেরিকাকে আসন্ন ও অনিবার্য্য অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বদেশে শ্রেণীসংগ্রাম হচ্ছিল তীব্রতর, আর আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ক্রমেই যাচ্ছিল সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনুকূলে। এরূপ অবস্থায় মার্কিন শাসকশ্রেণী যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের নীতি ঘোষণা করলেন। তাঁদের আশা, অ্যাটম বোমা ও প্লেগের জীবাণু দিয়ে তারা গণতন্ত্রের পথে ইতিহাসের অগ্রগতি রোধ করবেন এবং সারা পৃথিবীকে বানাবেন ওয়াল ষ্ট্রীটের কোটিপতিদের উপনিবেশ। তাই আজ বিশ্বগ্রাসের জার্মাণ ফ্যাসিষ্ট জুয়াড়ীদের স্থান দখল করেছেন তাদের মার্কিন সগোত্ররা। দুনিয়ার প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল অপসারিত হয়েছে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপারে—নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে।

তথাকথিত "মার্কিন জীবনধারার" ছদ্মবেশে জঘন্য জাতিবিদ্বেষ, অপর দেশ ও অপর জাতির উপর অন্যায় আক্রমণ, প্রলয়ের অস্ত্র বলে অ্যাটম বোমা নিয়ে মাতামাতি, যুদ্ধের মনোভাব গড়ে তোলার জন্যে বর্ব্বর প্ররোচনা—আজকের মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির এই সব সুপরিচিত লক্ষণের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মান ফ্যাসিজম ও জাপ জঙ্গীবাদের অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির চমৎকার মিল আছে। আজ আমেরিকার পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরিণ নীতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে দুটি সংগঠন কর্ত্তৃক: তথাকথিত জাতীয় নিরপত্তা সংসদ এবং জাতীয় নিরপত্তা সম্বল ও সঙ্গতি বোর্ড। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য হোমরাচোমরারা আছেন ঐ দুই সংগঠনের সদস্য হয়ে। একচেটে পুঁজির সর্ব্বশক্তিমান সঙ্ঘ ন্যাশানাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন ও তার গুপ্ত সাধারণ দপ্তরের সঙ্গে ঐ দুই সংগঠনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা সঙ্গতি বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন আর্থার হিল। ইনি মর্গাণ-গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত কতকগুলি ট্রাষ্টের ডিরেক্টর। তাঁর স্থানে এখন যিনি আছেন তিনিও মর্গান-গোষ্ঠীরই লোক। সুতরাং ঐ দুটি সংগঠনের সমস্ত সিদ্ধান্ত যে গৃহীত হবে বড় বড় ব্যবসার স্বার্থে, ওয়াল ষ্ট্রীটের কুমতলবের অনুকূলে, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জাতীয় অর্থনীতিকে ক্রমেই যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে দাঁড় করানো হচ্ছে। দেশের কর ও রাজস্ব নীতি নির্দ্ধারিত হচ্ছে এমনভাবে যাতে সমরোপকরণ-শিল্পের কুবেরদের মালিকরা তাঁদের মুনাফার পাহাড় ঢের বেশী বাড়াতে পারেন। এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৯৫০ সালের রাজস্ব বছরের জন্যে বাজেটে যে ২ হাজার ৯ শ কোটি ডলার সামরিক ব্যয়বরাদ্দ (যুদ্ধপূর্ব্ব ১৯৩৯-৪০ সালের চেয়ে ১৬ গুণ বেশি) ধরা হয়েছে, তার উপরেও অতিরিক্ত ১ হাজার ৬৭০ কোটি ডলার কংগ্রেস মঞ্জুর করেছেন বৃহৎ পুঁজিপতিদের চাপে পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমানের সমগ্র স্বরাষ্ট্র নীতির গায় ফ্যাসিজমের ছাপ। মার্কিন শাসক চক্র এক নতুন মহাযুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব্ব সম্পন্ন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলির নীতি সম্পর্কে ষ্টালিন বলেছিলেন: "..........মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে আক্রমণ করার আগে প্রধান প্রধান ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র—জার্মানী জাপান ইতালী—নিজের ঘরে বুর্জ্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিল, নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করল এক সন্ত্রাসমূলক বর্ব্বর শাসন।" তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ মার্কিন সরকারও ব্যক্তিস্বাধীনতার বাকী যেটুকু ছিল তাও কেড়ে নিচ্ছেন, প্রগতিবাদীদের ধরে ধরে জেলে পুরছেন, গেস্টাপোর অনুকরণে মার্কিন নাগরিকদের জন্যে 'আনুগত্য' পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, ফ্যাসিষ্ট "চিন্তা নিয়ন্ত্রণ"র কাছে মাথা নোয়াতে অস্বীকৃত অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত করছেন। প্রতিক্রিয়ার প্রধান আঘাত গিয়ে পড়ছে প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর। টাফ্ট হার্টলে আইনে ধর্ম্মঘট করতে নিষেধ করা হয়েছে; ট্রেডইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের অধিকার অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এই শ্রমিক বিরোধী আইনের বলে সম্প্রতি ট্রুম্যান রেল ও খনি শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট সৈন্যদল দিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন।

দিনের পর দিন কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে নতুন নতুন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। ঐ পার্টির ১১ জন নেতাকে দণ্ডিত ও সেক্রেটারী ইউজেন ডেনিসকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। কতকগুলি রাষ্ট্র ও সহর কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যকলাপ নিষিদ্ধ করে আইন ও অর্ডিন্যান্স পাশ করেছে। ২৩শে সেপ্টেম্বর ম্যাক করার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীলদলের সভ্যদের (যাদেরই ফ্যাসিষ্ট মার্কিন শাসকরা 'সন্ত্রাসবাদী' বলে মনে করছেন তাঁদেরই) বিচার বিভাগের কাছে গিয়ে নামধাম লিখিয়ে আসতে হবে, তা না করলে ১০ বছরের কারাদণ্ড; এর উপর আছে মোটা টাকা অর্থদণ্ড। এই জঘন্য আইনের বলে পুলিশের সন্দেহভাজন যে কোনো আমেরিকানকে বিনা বিচারে আটক রাখা বা জেলে পাঠানো যায়। এই আইন বিল অব রাইটসকে পায়ের তলায় পিষে মারছে। এ আইন মার্কিন শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৩৩ সালে নিজেদের রক্তপাত আর ত্রাসের রাজত্বকে 'আইন সঙ্গত' অনুমোদন দেবার জন্যে হিটলার-গোয়েরিং-হিমলার কোম্পানী যে "জরুরী ক্ষমতার আইন" পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন তার সঙ্গে এই আইনের তুলনা করেন মার্কিন প্রগতিশীল মহল। মার্কিন গেষ্টাপোর বড় কর্ত্তা এডগার হুভার তো বলেই ফেলেছেন, ম্যাক্কারান আইনের বেড়াজালে সাড়ে পাঁচ লক্ষ আমেরিকানকে আটকে তোলা যাবে।

সারা দেশে বয়ে যাচ্ছে জাতি বিদ্বেষের ঢেউ। এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মার্কিন নিগ্রোর ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই বললেই হয়। এমন কি কংগ্রেস ভবনের মধ্যেও তাদের উপর মারধোর চলে। সম্প্রতি এক অধিবেশনের কালে কংগ্রেসের প্রতিনিধি লান্হাম্ বিখ্যাত নিগ্রো জনসেবক উইলিয়ম প্যাটার্সনকে তেড়ে মারতে গিয়েছিলেন। প্রগতিশীল মহলের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিক্রিয়া ক্রমেই সন্ত্রাস ও ফ্যাসিষ্ট পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে। মার্কিন ফ্যাসিজমের ঝটিকা-বাহিনী কু-ক্লাক্স-ক্লান, ও আমেরিকান লিজিয়ন অসম্ভব কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট যতই তীব্র হয়ে উঠেছে ও মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি পরাজয়ের পর যতই পরাজয় ঘটছে এবং শান্তি ও গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতই শক্তিশালী হচ্ছে, ততই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরোপুরি ফ্যাসিষ্টরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার বিপদ বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, আমেরিকায় ফ্যাসিজম অবশ্যম্ভাবী। মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ইউজেন ডেনিস বলেছেন, মার্কিন জনগণই ফ্যাসিষ্ট পুলিশ রাষ্ট্র গড়ার চক্রান্ত বানচাল করে দিতে পারেন। ফ্যাসিষ্ট আইনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে এবং এক মার্জ্জিত জীবনযাত্রা ও শান্তির জন্যে মার্কিন জনগণের আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। ধর্ম্মঘট আন্দোলন ব্যাপক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি ৩ লক্ষ রেল শ্রমিক, ৩০ হাজার মিস্ত্রী, সমান সংখ্যক মোটর কারখানার শ্রমিক এবং জাহাজ ও তৈলশিল্পের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করেছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ট্রেড-ইউনিয়নগুলির পক্ষে এসে ক্রমেই বেশি করে দাঁড়াচ্ছে প্রগতিশীলদল সিভিল রাইটস্ কংগ্রেস, কমিটি ফর্ পিসরোডস্, শ্লাব কংগ্রেস ও অন্যান্য আমেরিকান প্রতিবাদী সংগঠন। কঠোর দমন নীতির বাধা সত্ত্বেও ষ্টকহোম আবেদনে সই করেছেন পঁচিশ লক্ষ মার্কিন নরনারী। "কোরিয়া থেকে সরে এস" দাবীর আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন লক্ষ লক্ষ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন আমেরিকান।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধবাজদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিশালী শান্তি শিবির। এই শান্তির শিবিরে সোবিয়েৎ দেশ ও নয়া-গণতন্ত্রগুলির জনগণ ছাড়াও আছেন সারা দুনিয়ার কোটি কোটি সাধারণ মানুষ।

—টাস

লেখক:—এন, ইনোজেমৎসেফ

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের দালালী ও হিন্দ মজদুর সভার চক্রান্ত ব্যর্থ করে—

কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে শান্তি আন্দোলনের পরিপোষকরূপে গড়ার কৌশল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে শ্রমিক সংহতিতে ফাটল ধরানো এবং শ্রমিকদের ভাওতা দেওয়া। এরা সময় বুঝে কখনও সোজাসুজিভাবে সরকারের জয়গান করে আবার কোন সময় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মহড়াও করে। সুতরাং শ্রমিক ঐক্য গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কৌশলী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালানো প্রয়োজন। একে ধ্বংস না করে শ্রমিক ঐক্যের সুষ্ঠু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা বাতুলতা।

ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে মুখোস পরা শ্রমিকদরদী জয়প্রকাশ পন্থী হিন্দ মজদুর সভা। এরা প্রকৃত পক্ষে আন্তর্জাতিক দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের ভারতীয় শাখা। শ্রমিক ঐক্যগড়ে তুলবার পথে এরা এক বিরাট অন্তরায়। আপাত দৃষ্টিতে এরা শ্রমিকের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের কথা এবং আরও অনেক শ্রমিক দরদী কথা বললেও প্রকৃত পক্ষে এরা পুঁজিবাদের সাথে আপোষের মারফৎ চলে এবং শ্রমিকের স্বার্থকে কুঠারাঘাত করে এর প্রমান মিলবে এদের পরিচালিত ধর্মঘটে; প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের নেতৃত্বে ধর্মঘট শেষপর্যান্ত বিশ্বাস-ঘাতকতায় রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বিল মালিকদের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক ধর্মঘট চলিলেও এরা সর্ব্ব ভারতীয় আন্দোলনের মারফৎ পুঁজিবাদকে উৎখাত করার পক্ষ-পাতী নয়। প্রকৃতপক্ষে এরা পুঁজিবাদেরই পরোক্ষ দালাল। অনেকে মনে করেন যে ধনতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে এদের পাবার আশা আছে সুতরাং পুঁজিবাদ বিরোধী সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ান ফ্রন্টে এদের স্থান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ নীতি আত্মহত্যারই নামান্তর। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা শোষক গোষ্ঠীর পর্য্যায়ভুক্ত, যখন তারা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় অবতীর্ণ হয়েছে তখন ধনতন্ত্র বিরোধী ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে তাদের পাবার আশা করা বাতুলতা। কিন্তু এদের সাথে কংগ্রেস ও আই এন, টি, ইউ, সি বিরোধী বিভিন্ন বিশেষ এবং আঞ্চলিক দাবীর ওপর ভিত্তিকরে সংযুক্ত আন্দোলন করতে হবে। কিন্তু এই আন্দোলনের সময় অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আন্দোলনের সাথে সাথে এদের আপোষকামী নেতৃত্বের মুখোস, কর্ম্মী এবং জনসাধারণের সামনে তুলে ধরাই হবে আমাদের নীতি। এর মারফৎ জনশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন গুটিকয়েক সোস্যাল ডেমোক্রটিক নেতারা কোন প্রকারেই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এই একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে নিজেদের কর্ম্মীদের এদের সংগঠনেও ঢুকিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাই ট্রেড ইউনিয়ান ঐক্যের দ্বিতীয় কর্ম্মসূচী হচ্ছে এই সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতৃত্বকে শ্রমিক-সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

শেষে মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যান্য আন্দোলনের ন্যায় ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনেও প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদ বিরোধী আন্দোলনই চালিয়ে এসেছে। এর মারফৎ এতদিন ধরে জনতার ওপর যে ফাঁকা প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে পরবর্ত্তী কার্য্যক্রমে। রন্দিভে মার্কা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দেখতে পাই যে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনকে নিছক দলীয় স্বার্থে তারা প্রত্যক্ষ ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। এতদিনের বামপন্থী শক্তি সম্বলিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস অবস্থা প্রস্তুতির পূর্ব্বেই কম্যুনিষ্ট পার্টির রাতারাতি বিপ্লব করার নীতি গ্রহণে ভেঙ্গে যায়। যেখানে প্রকৃত সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ে তোলা—সেখানে তারা তার মূলে কুঠারাঘাত করে একদিকে পরোক্ষভাবে সরকারকে সাহায্য করেছে অন্যদিকে নিজেদেরও সাথে সাথে অসাম্যবাদী বলে পরিচয় দিয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির এই নীতি ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে ফাটল ধরিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু অন্যদিকে এর সাথে সাথে বিভিন্ন বামপন্থী শক্তির প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের কার্য্যক্রম নিয়ে গড়ে উঠছে সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস।

বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট পার্টি তার পুরানো ভুল শুধরাবার চেষ্টায় এক নূতন ভুলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই ভুল অতীতের ভুলের বিপরীত প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদিন তারা কথায় কথায় সকলকেই পুঁজিবাদের দালাল বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু বর্ত্তমানে সে সুর পালটিয়ে—একমাত্র বড় বুর্জ্জোয়া ছাড়া দেশের আর সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট করা যায়—এই নীতি ঘোষণা করছে। এই ফ্রন্টে এমনকি জয়প্রকাশকে নিতেও তারা প্রস্তুত। যখন কমিনফর্ম্ম সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সম্পর্কে বার বার ঘোষণা করছে যে, এদের জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন না করলে শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব তখন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সে নীতিকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে ও আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগের কথা একমাত্র পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করছে। বর্ত্তমানে তারা আবার নূতন করে শ্রমিক ঐক্যের কথা প্রচার করছে সত্য কিন্তু তারজন্য যে পথ অবলম্বন প্রয়োজন সেটাকে অগ্রাহ্য করে এখনও অনৈক্যকেই সাহায্য করছে। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ভ্রান্তনীতি সম্পর্কে শ্রমিক সাধারণকে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

এই ভাবেই শ্রমিক শ্রেণীর সংযুক্ত আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে হবে। কংগ্রেসী শোষণ এবং শাসন বিরোধী শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল সমস্ত শক্তিকে নিয়ে এবং ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে এই আন্দোলন শক্তি সংগ্রহ করবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত আর একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে এর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ জন-সমাবেশ না করতে পারলে জনসাধারণের জীবন ও শান্তি সবদিক দিয়েই বিপন্ন হবে। প্রকৃত পক্ষে আজকের দিনে শান্তি আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন। তাই শান্তি আন্দোলনের অগ্রদূত শ্রমিকশ্রেণীকে শান্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ করাই বর্ত্তমানের কার্য্যক্রম। শ্রমিক সাধারণের সামনে এই কর্ম্মসূচী তুলে ধরাই প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ান কর্ম্মীর কর্ত্তব্য।

সংঘবদ্ধ আন্দোলনই এই দুরবস্থার প্রতিকার করবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাহলে দেখা গেল প্রত্যেক বছরেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে দেশের মধ্যে। তাছাড়া আমদানী করা খাদ্যতো আছেই। বিড়লার ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রিকার হিসাব মতে :—

১৯৪৬-৪৭ সালে	২৭ লাখ ২৮ হাজার টন
১৯৪৭-৪৮	৩২ ,, ৫০ ,, ,,
১৯৪৮-৪৯ ,,	৪০ ,,

খাদ্য আমদানি করা হয়েছে বিদেশ থেকে। তাহলে ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব কেন? এর উত্তর অতি সাধারণ। পুঁজি-বাদী দেশের এটা হল দস্তুর। দেশে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমান মাল উৎপাদিত হলেও তাকে কৌশলে কম করিয়ে রাখা। তা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে ফেলে হ'ক, যেমন আমেরিকায় করা হয়ে থাকে, নয় গুদামে চেপে রেখে। ভারত-বর্ষে কালোবাজার করার জন্যে কোটী-পতিরা শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি ভালভাবে চালাচ্ছে বলতে হবে। এক পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলা হতে তিন লাখ মণ চালের চোরা কারবার চলে বিহারের মানভূম জেলার আড়তদারদের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির খাদ্য-নীতি যা তাতে এই সব ধনী কোটী-পতিদের যারা খাদ্যদ্রব্য কালোবাজারী করে কোটি কোটি মুনাফা, তাদের গায়ে হাত দেওয়া হয় না। তার বদলে গরীব ও সাধারণ মধ্য চাষীদের কাছ থেকে জোর করে খাদ্যদ্রব্য যৎসামান্য মূল্যে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেসী সরকার পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারি তাই তো তাদের লাভের সুযোগ দেবার জন্য দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের অবস্থা তারা জিইয়ে রেখেছে।

মার্কিন মুল্লুকে প্রকাশ্যে যেমন খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে ফেলা হয় বড়লোকদের মুনাফা বাড়াবার উদ্দেশ্যে এখানে সে কাজটা অন্যভাবে হচ্ছে। যে সমস্ত সর-কারি গুদাম আছে তাতে বছরে হাজার হাজার মণ খাদ্যশস্য পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই অপচয়ের পরিমান যে কত তা সরকার জনসাধারণকে জানাবার প্রয়ো-জন পর্য্যন্ত বোধ করে না। এইভাবে কংগ্রেসী সরকারের কৃপায় একদিকে দেশবাসী উপোস করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে অন্যদিকে জনা-কয়েক বড়লোকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হু হু করে ফেঁপে চলেছে। এর প্রতিকার জনতার হাতে। লোকে [illegible] অবিচার সহ্য করলে অবিচার বেড়েই চলে, অবিচার অত্যাচারকে প্রত্যা-ঘাত করতে হয় সংঘবদ্ধভাবে। ভাল-ভাবে খেয়ে পরে মানুষের মত বাঁচার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে তবেই এই দুরবস্থার প্রতিকার মিলবে।

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

সিংভূম জিলায় শান্তি আন্দোলন

সংযুক্ত শান্তি আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান

● শান্তি আন্দোলনের সহিত জনতার বাঁচার দাবী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

★

(সংবাদদাতার পত্র)

গত ৭ ই ডিসেম্বর সোসালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সিংভূম কমিটির উদ্যোগে মৌভাণ্ডার বারী ময়দানে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শান্তি আন্দোলন, ভারতে শান্তি আন্দোলনের প্রসার ও বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য উক্ত সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। সভার সভাপতিত্ব করেন বিহার প্রাদেশিক সি, পি, ডবলিউ, ডি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ও খনি মজদুর নেতা কমরেড প্রীতিশ চন্দ।

কমরেড কৃষ্ণা চোবে গণ সঙ্গীত করেন সভার প্রথমে। কমরেড সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, "দুনিয়াজোড়া শান্তি আন্দোলন জোরদার হইতে চলিয়াছে, অথচ ভারতবর্ষে তেমন কোন সক্রীয় আন্দোলন এখনও সুরু হয় নাই। একদিকে নিপীড়িত জনসাধরণ শান্তি চায় অন্যদিকে পুঁজিপতিরা পুঁজি বাড়াইবার সুযোগ হিসাবে আর একটি যুদ্ধ বাধাইবার জন্য ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। যুদ্ধবাজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা বানচাল করিতে হইলে শান্তিকামী জনসাধারণকে সংগঠিত হয়ে প্রবল আন্দোলন করিতে হইবে।"

সোস্যলিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ শান্তি আন্দোলনের তাৎপর্য্য সহজভাষায় বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা কংগ্রেসী সরকার মেটাইতে পারে নাই, কোন পুঁজিবাদী সরকারই তা পারে না। সুতরাং আজিকার শান্তি আন্দোলন জনসাধারণের দাবী দাওয়া আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।"

কমরেড হীরেন সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "শান্তি আন্দোলন কোন দলগত আন্দোলন নয়—নিপীড়িত জনসাধারণের জীবন ধারণের আন্দোলনের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ। তাই শান্তি আন্দোলনের সাফল্য লাভ তখনই সম্ভব হইবে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ও শান্তিকামী জনসাধারণ মাত্রই সম্মিলিত হইয়া আন্দোলন করিবে।" তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, "কম্যুনিষ্ট পার্টি শান্তি আন্দোলনে দলগত রূপ দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। জনসাধারণ যদি ঐ বিভ্রান্তকারী পথ ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে শান্তি আন্দোলনের প্রচার মারফৎ সংগঠিত হন তবেই প্রকৃত সক্রিয় আন্দোলন সুরু করা যাইবে।"

কমরেড কৃষ্ণা চোবে বলেন, "বিভিন্ন দলীয় গোড়ামী ত্যাগ করিয়া সম্মিলিত ফ্রণ্ট জোরদার করাই এখন উচিত। জনসাধারণের সমস্ত দাবী দাওয়ার আন্দোলনই ঐ সম্মিলিত নেতৃত্বের মারফৎ চলিলে সাফল্য লাভ করিবে। সেই সম্মিলিত মোর্চাই শান্তি শিবিরকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।"

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বাস্তুহারা কোন কালেই নয় এমন পরিবারকেই জমি দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার অবশ্য জনতার নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের কথা খুব ফলাও করে প্রচার করে নিজেদের সাধুতা, ও বদান্যতা ও কর্ত্তব্যপরায়নতার ঢাক পেটাচ্ছে। অথচ আদতে ব্যাপারটা উল্টো। কংগ্রেসী সরকারের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে এই ব্যাপারটা করেছে। শুধু মোটা মাইনের কর্ম্মচারিরাই যে এই ব্যাপারে একেবারে দোষী তাও নয়। রাজস্থানের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বড় বড় নেতাদের 'রেকমেনডেশন' পত্রও এই সব ভুয়া উদ্বাস্তুর দল যোগাড় করেছিল। তাঁরা যে এমনি এই সব পত্র দিয়েছেন তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসী সরকার এর মধ্যে জড়িত সে কথা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। উপরন্তু এই কেচ্ছা প্রকাশিত হবার পরও কোন ব্যাবস্থা অবলম্বন করা হয়নি দোষীর বিরুদ্ধে। ঋণ হিসাবে এই ৪০ লাখ টাকা মঞ্জুর হলেও এখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

● "ভারতে শান্তি আন্দোলনে বামপন্থী বিচ্যুতি ও অনৈক্য" ●

মহাশয়,

বহুদিন যাবৎ ভারতে শান্তি আন্দোলন চলছে। ষ্টক হলম আবেদনে পৃথিবীর প্রত্যেকটী দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতে শান্তি আন্দোলন আজ নামে মাত্র আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ। ষ্টক হলম আবেদনে কিছু "সহি সংগ্রহ" করা ছাড়া শান্তি আন্দোলনের বিশেষ কিছুই দেখা যায়নি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শ্রমিক দলগুলি শান্তি আন্দোলনকে যেখানে প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে সেখানে ভারতের বেশীর ভাগ বামপন্থী দল ইহাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কয়েক লক্ষ সহি সংগ্রহ করা বা দু-একটী কনভেনশন্ আহ্বান করাই শান্তি আন্দোলনের চরম সার্থকতা বলে মনে করা হয়েছে। জনসাধারণ শুধুমাত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে সহি দিলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে না একথা তাদের বোঝাতে হবে। সংঘবদ্ধ জনসাধারণের সক্রিয় প্রতিরোধ না থাকলে যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না। শোষণের পথ উন্মুক্ত রাখবার জন্য যুদ্ধবাজরা জোর করে জনসাধারণের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে যে হেতু যুদ্ধই "পুজিবাদী সঙ্কট" ক্ষনিক সমাধানের একমাত্র সম্বল। পুজিবাদী শোষণে জর্জ্জরিত কোটী কোটী বেকার জনসাধারণকে যুদ্ধ কাজে নিয়োগ করে সাময়িক ভাবে তাদের বিক্ষোভের হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ—'যুদ্ধ'। একটা যুদ্ধ বাধাতে পারলে আপাততঃ কিছুদিনের মত নিশ্বাস ফেলা যায়, উপরন্তু মুনাফা লোঠা যায় ও প্রচুর তাই যুদ্ধ পুজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের একান্ত কাম্য। সুতরাং কোটী কোটী জনসাধারণ এবং দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে রুখতেই হবে। কিন্তু এই যুদ্ধ রোধার একমাত্র পথ সহি দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকামীদের যুদ্ধলিপ্সাকে চিরতরে বিলোপ করতে হলে শান্তিকামী জনসাধারণের আজ সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন প্রতি গ্রামে, মহল্লায় আজই যুদ্ধ বিরোধী শান্তি-বাহিনী গড়া দরকার। যুদ্ধ যদি হয় তবে জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সুতরাং এই যুদ্ধকে তাদেরই রুখতে হবে বাঁচার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য এই চেতনা জনসাধারণের মধ্যে জাগাতে হবে। কিন্তু তা কি সম্ভব হয়েছে? এইখানেই বামপন্থী আন্দোলনের সবচাইতে বড় বিচ্যুতি। শান্তি আন্দোলন একমাত্র "সহি সংগ্রহ" আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, তাই তা কোনরূপ গনআন্দোলনে রূপ নেয়নি এবং এই নীতিতে নেওয়া সম্ভবও নয়।

দ্বিতীয়তঃ শান্তি আন্দোলনের সবচাইতে বড় অন্তরায় যে আজও পর্য্যন্ত ভারতে কোন বামপন্থী ঐক্য সম্ভব হইল না। যে সব দল নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের সাধারণ কর্ম্মসূচী একই হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেনা কেন? গত নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনে এই ঐক্যের অভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এই চরম অবস্থায় ও শান্তি সম্মেলনে (পঃ বঙ্গ) জনসাধারণের ঔদাসীন্য নেতাদের বিশেষ শিক্ষার বিষয়। ষ্টক হলম আবেদনের মুল ভিত্তি অনুযায়ী যে কোন শান্তিকামী মানুষকে শান্তি আন্দোলনের পিছনে টানা ত দূরের কথা, সত্যিকারের বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলিও একত্রে মিলিত হয়ে এই শান্তি আন্দোলনকে জোরদার করার মত ক্ষমতা রাখেনা, শান্তি আন্দোলনের নামে ভারতে ষ্টকহলম আবেদনের অপপ্রয়োগ করা হয়েছে এবং হচ্ছে; ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের এর বেশী কি অবনতি হতে পারে! আশা করি বামপন্থী নেতাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে। দেশে সত্যিকারের সংযুক্ত শান্তি আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করবে।

ইতি—

মোসাম্মাৎ হামিদা

পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩।ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত